ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
একবিংশতিতম সংখ্যা,
ডিসেম্বর ২০০১, পৌষ ১৪০৮

বাংলাদেশে শিল্পায়ন ঃ তিন দশকের অভিজ্ঞতা

মোঃ আমজাদ হোসেন *

Industrialization in Bangladesh : Experience of three Decades

- Md. Amzad Hossain

Abstract : Industrialization plays pivotal role in the economic development of a country. It is evident from the experiences of many developed countries that in one hand, industrialization ensure the proper utilization of natural resources and on the other hand, it helps to maintain balance of the economy by absorbing huge mass of increasing population. Bangladesh experiences different policy regime in the industrial sector since independence. It has pivoted its nationalized policy into a market oriented liberalized policy. However due to inherent problems in the economy and the implementation failure the industrial sector has seen a frustrated takeoff over the last decades. These bottleneck and drawback must be removed for bringing dynamism in this sector so that it can play dominant role in the economic development of our country.

ভূমিকা

অর্থনীতির দ্রুত বিকাশের পথে শিল্পখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই শিল্প খাতকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের "Power House" হিসেবে অভিহিত করা হয়। বর্তমান বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর উন্নয়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এসব দেশের শিল্প খাতের দ্রুত ও ক্রমবর্ধমান বিকাশের কথা গুরুত্বের সাথে স্বীকার করতে হয়। বর্তমান সময়ের দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী (Emerging Tiger) দেশগুলো যেমন- সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, মালেশিয়ার দিকে তাকালেও শিল্প খাতের গুরুত্বের কথা অনুমান করা যায়। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও এদেশের

* প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পের গুরুত্বকে খাট করে দেখার অবকাশ নেই। শিল্পখাত একদিকে যেমন প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে তেমনি অন্যদিকে দ্রুত বৃদ্ধিমান উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার কর্ম সংস্থানের মাধ্যমে অর্থনীতির ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। একারণে স্বাধীনতার পর পরই শিল্প খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। এর ফল হিসেবে আমরা গত তিন দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামোগত যে পরিবর্তন দেখতে পাই তা হচ্ছে জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান হ্রাস এবং অন্যান্য খাতের অবদান বৃদ্ধি। কিন্তু জিডিপিতে অন্যান্য খাতের অবদান চোখে পড়ার মত বৃদ্ধি পেলেও, শিল্প খাতের অবদান খুব সামান্য বেড়েছে। শিল্পখাতের উন্নয়নে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই শিল্প জাতীয়করণ নীতি গ্রহণ করা হয় কিন্তু সরকার পরিবর্তনের অব্যবহিত পরেই বিরাষ্ট্রীকরণ নীতি গ্রহণ করা হয়। ১৯৮০ এর দশকের শুরু শিল্পখাতে বাজারমুখী সংস্কার নীতি গ্রহণ করা হয়। বলতে গেলে, এখনো এ বাজারমুখী বিরষ্ট্রীকরণ নীতি অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে এ নীতিগুলোর প্রয়োগ বিভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে। ফলে এ নীতিগুলোর মিথষ্ক্রিয়া (interaction) বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করছে। এ সকল সমস্যার ফলে একদিকে সৃষ্টি হয়েছে রাষ্ট্রীয় খাতে অলাভজনক ও বোঝাস্বরূপ কয়েকটি কর্পোরেশনের অধীনে বিভিন্ন শিল্প এবং অন্যদিকে বেসরকারি খাতে রুগ্ন শিল্পের (Sick Industries) সংখ্যা আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি। বাস্তবিক পক্ষে, সরকারি নীতিমালা 'Enterprenurial Development' এ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেনি। তাই শিল্পখাতে দীর্ঘমেয়াদী স্থবিরতা বিরাজ করছে অর্থাৎ জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান গড়ে ১২-১৫ শতাংশের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে (সারণী-১)

সারণী -১ ঃ জিডিপিতে বিভিন্ন খাতের অবদান, ১৯৭৩-১৯৯৯

	১৯৭৩-১৯৭৮	১৯৭৯-১৯৮২	১৯৮৩-১৯৮৮	১৯৮৯-১৯৯২	১৯৯৩-১৯৯৫	১৯৯৫-২০০০
জিডিপি প্রবৃদ্ধি	৪.১২	৪.৫৩	৪.১০	৪.২১	৪.৪০	৫.৭১
কৃষি	২৭.৪	৪.১২	২৪.০৭	২৫.৭৫	২৬.০৫	৩২.১
শিল্প	১৫.৩	১৫.৮৩	১৬.১৫	১৬.৩০	১৬.৪৫	১৯.৪
নির্মাণ	৫.৩	৬.৪৮	৩.৩২	৬.১৭	৫.৭৫	৭.৬৫
সেবা	৫২.০	৫৫.৮৩	৫৬.৪৬	৫১.৭৮	৫১.৭৫	৫৪.০২

উৎস ঃ Asia-Pacific Development Journal, Vol 5, No. 1, জুন ১৯৯৮, পৃঃ ৭৫ এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা বিভিন্ন সংখ্যা

নোট ঃ (২)-(৬) নং কলমের সংখ্যাগুলো ১৯৮৭/৮৫ সালের স্থির দামে এবং ৭নং কলামের সংখ্যাসমূহ ১৯৯৫/৯৬ সালের স্থির মূল্যে ।

তাই শিল্পখাতের এ স্থবিরতার কার্যকারণ সমূহ সম্পর্কে অবহিত হওয়া বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের শিল্পখাতের যথাযথ বিকাশ না হওয়ার কারণসমূহ উদঘাটনের প্রচেষ্টা চালানো এবং এর সাথে সাথে শিল্পখাতের বিদ্যমান সমস্যাগুলো কাটানোর উপায় অনুসন্ধানের চেষ্টা করা এবং বিগত তিন দশকের শিল্পনীতির সমালোচনা মূলক আলোচনার মাধ্যমে শিল্পখাতের বর্তমান পারফরমেন্স তুলে ধরা। এ প্রবন্ধের আলোচনায় Secondary উপাত্তের সাহায্য নেয়া হয়েছে তবে কোন জটিল গাণিতিক ও সংখ্যাতাত্ত্বিক (Empirical & Econometric) মডেল estimate করা হয় নাই।

এ প্রবন্ধ ১০টি অংশে বিভক্ত। দ্বিতীয় অংশে বাংলাদেশে শিল্প পুঁজি বিকাশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অংশে যথাক্রমে ১৯৭০, ১৯৮০ এবং ১৯৯০ এর দশকের শিল্পখাতের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ষষ্ঠ অংশে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম বর্ণনা করা হয়েছে। ৭ম অংশে বিসিক এর কার্যক্রম সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। অষ্টম অংশে শিল্পখাতের প্রতিবন্ধকতা সমূহ এবং তাদের সমাধানের উপায়সমূহ আলোচনা করা হয়েছে। নবম অংশে বাংলাদেশের শিল্পায়নে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতির প্রভাব সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে। এবং সবশেষে ভবিষ্যতের করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

২.০ বাংলাদেশে শিল্প পুঁজির বিকাশ ঃ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত

পৃথিবীর অনেক উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় বাংলাদেশের শিল্পখাত এখনো অনুন্নত অর্থাৎ বাংলাদেশের শিল্প পুঁজি যথাযথভাবে বিকশিত হয় নাই। যথেষ্ট কাঁচামাল সহ প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সস্তা শ্রমিক থাকলেও প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাবে আমাদের শিল্পখাত এখনো সংকুচিত। এর কার্যকারণ ঐতিহাসিক। প্রাচীন বাংলার সামাজিক স্তর বিন্যাসের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে, বাংলার সমাজে ব্যবসামুখী বৈশ্য শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে নাই। শুধুমাত্র ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলের জনগণের মাঝে ব্যবসা বাণিজ্যের আগ্রহ লক্ষ্য করা গিয়েছিল (হবিব-১৯৭৮)। ঔপনিবেশিক আমলেও এ ধারা বজায় ছিল। ইংরেজ শাসনামলে অবিভক্ত বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র ছিল ইংরেজী শিক্ষিত হয়ে সরকারি চাকুরি করা। অবশ্য বৃটিশ সরকারের নীতিও শিল্পপুঁজির বিকাশ না হবার অন্যতম কারণ।

ইংরেজ সরকার এ দেশকে শিল্পের কাঁচামালের উৎস হিসেবে এবং বৃটেনে উৎপাদিত শিল্প পণ্যের বাজার হিসেবে ব্যবহার করে। ঐ সময় জনগণের চাপে বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ প্রভৃতি বড় শহরে কিছুসংখ্যক শিল্প কারখানা স্থাপন করা হয়। কিন্তু ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর অধিকাংশ হিন্দু জমিদার, পুঁজিপতি, উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, ব্যাংকার এ দেশ ত্যাগ করে ভারতে পাড়ি জমায়। ফলে, শিল্পসহ বাংলাদেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। ভারত থেকে আগত দরিদ্র, চাষী মজুর ও সামান্য পুঁজি মালিকদের দ্বারা এ শূন্যতা পূরণ করা সম্ভব হয় নাই। ঐ সময়কার পূর্ব পাকিস্তানের জিডিপি-র প্রতি লক্ষ্য করলে বিষয়টি স্পষ্টতঃ ধরা পড়ে। ১৯৪৭/৪৮-১৯৬৯/৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ছিল প্রায় ৬৭.৮ শতাংশ। অন্যদিকে শিল্প খাতের অবদান ছিল মাত্র ৩.৮ (উদ্দিন-১৯৭৫) শতাংশ। পাকিস্তান সরকারের আমলেও বাংলাদেশের শিল্প খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয় নাই। এ দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগই সাবেক পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প স্থাপনে ব্যয় করা হয়। আঞ্চলিক বৈষম্যের কারণে পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের শিল্প খাতে স্থবিরতা বিদ্যমান ছিল। ১৯৪৯/৭০ হতে ১৯৬৯/৫০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের উন্নয়ন ব্যয় ছিল ৮৯৩০.২ কোটি টাকা (১৯৫৯/৬০ সালের স্থির দামে) যার মধ্যে মাত্র ২৮৯৭.৭ কোটি অর্থাৎ ৩০ শতাংশের সামান্য বেশী পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয়িত হয়েছিল। যদিও পরবর্তীতে এ দেশের শিল্পের উন্নয়নে East Pakistan Industrial Development Corporation (EPIDC) স্থাপন করা হয় তথাপি দৃঢ় রাজনৈতিক অংগীকার এর অভাবে এ দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিল্প স্থাপন করা হয় নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ১৯৬০ এর দশকে সমগ্র পাকিস্তানের শীর্ষ বিশজন শিল্পপতির মধ্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে মাত্র একজন শিল্পপতি ছিল বাকী ১৯ জনই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের। তাই স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের শিল্প খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু এ সকল নীতির অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কারণে বাংলাদেশের শিল্পখাতে পুঁজির যথাযথ বিকাশ ঘটে নাই।

৩.০ ১৯৭০ এর দশকে বাংলাদেশের শিল্পখাত

১৯৭০ এর দশকের প্রথমভাগ (১৯৭০-১৯৭৫) ছিল শিল্প রাষ্ট্রীয়করণের। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সফল অবসানে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হবার অব্যবহিত পরেই ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৭ এর মাধ্যমে

বাংলাদেশে শিল্পের জাতীয়করণ শুরু হয়। ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী মেনিফেস্টো, দলের মধ্যকার আভ্যন্তরীণ চাপ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ফেলে যাওয়া ও ধ্বংস করা শিল্প সমূহের সংস্কারসহ পুনরায় চালুকরণ জাতীয়করণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে (বায়েস ও অন্যান্য ১৯৯৮)।

জাতীয়করণ এর প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে সকল পরিত্যক্ত মাঝারি ও বড় শিল্প ইউনিটসমূহকে সরাসরি সরকারি তত্ত্বাবধানে আনা হয় এবং বেসরকারি শিল্প ইউনিট যাদের স্থির সম্পদের মূল্যমান ১৫ মিলিয়ন টাকার বেশী ছিল সেগুলোকেও সরকারি পরিচালনার আওতায় আনা হয়। শুধুমাত্র ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং বিদেশী মালিকাধীন শিল্প ইউনিটগুলো সরকারি খাতের বাইরে রাখা হয়। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এ সময়কালে ৭২৫টি ইউনিটকে ১০টি সরকারি কর্পোরেশনের আওতায় আনা হয় যেগুলার মোট স্থির সম্পদের মোট পরিমাণ ছিল মোট শিল্প মূলধনের ৯২ শতাংশ (বায়েস ও অন্যান্য ১৯৯৮)। আরেক তথ্য মতে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত পাট, বস্ত্র ও চিনি শিল্পের ১৬৯টি প্রতিষ্ঠানকে সরকারি খাতের আওতায় আনা হয়। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, জাতীয়করণের প্রাথমিক পদক্ষেপে দেশের শিল্প সম্পদ তথা বড় বড় স্থাপনাসমূহ সরকারি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এছাড়া, এ সময়ে বেসরকারি বিনিয়োগের সীমা ২.৫ মিলিয়ন টাকায় নির্ধারণ করা হয়।

স্বাধীনতার পর অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে শিল্প জাতীয়করণ প্রক্রিয়া শুরু হয় সে উদ্দেশ্য মোটামুটি ব্যর্থ হয় বলে মনে করা হয় যদিও অনেকে দেখানোর চেষ্টা করেন যে, ১৯৭২ হতে ১৯৭৫ পর্যন্ত সময়ে জাতীয়করণকৃত শিল্প সমুহে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় (সোবহান ১৯৮৩)। জাতীয়করণকৃত শিল্প সমূহের ব্যর্থতার জন্য নিম্নোক্ত কারণ সমূহকে দায়ী করা হয়-(১) জাতীয়করণকৃত শিল্প সমুহের পরিচালনায় অদক্ষতা (২) জাতীয়করণকৃত শিল্প সমূহের সায়ত্ত্বশাসনের অভাব (৩) ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটি (৪) বাণিজ্যিককরণের পরিবর্তে জাতীয়করণকৃত শিল্প সমূহের পরিচালনা কাঠামোকে দলীয়করণ ইত্যাদি (বায়েস ও অন্যান্য ১৯৯৮)। এছাড়া, কাজকর্মে সমন্বিত প্রচেস্টা না থাকা, সুস্পষ্ট দায়িত্ব বন্টন না হওয়া পারস্পরিক আস্থা সৃষ্টির অভাব এবং সুষ্ঠ পরিকল্পনার অভাব, জনগণের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের কোন উদ্যোগ না করা ইত্যাদির ফল এ সময়ে জাতীয়করণকৃত শিল্পসমূহে নজিরবিহীন দুঃখজনক অবস্থার সৃষ্টি হয় (হাবিব উল্যাহ, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ২৮২-৮৭)।

জাতীয়করণের এ পর্যায়ে বেসরকারি শিল্প ইউনিটসমূহও হতাশাজনক পারফরমেন্স প্রদর্শন করে। বিশেষতঃ ব্যক্তিগত বিনিয়োগ সীমা ২.৫ মিলিয়ন টাকা অযৌক্তিক প্রমানিত হয়। এবং দেশের আইন শৃংখলা পরিস্থিতির এতই অবনতি হয় যে, ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাগণ শিল্প স্থাপনে আস্থা হারাতে থাকে। সর্বোপরী পুনরায় জাতীয়করণের ভয় এবং সরকারি প্রণোদনার অভাবে বেসরকারি খাতও সংকুচিত হয়।

এ অবস্থা হতে উত্তোরণের লক্ষ্যে এবং বেসরকারি খাতকে প্রণোদিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৭৫ সালে পুনরায় নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয়। এ নীতির প্রধান দিকগুলো ছিল ঃ

(ক) বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ সীমা শিথিল করে ২.৫ মিলিয়ন টাকা হতে ৩০ মিলিয়ন টাকায় (পরবর্তীতে ১০০ মিলিয়ন) উন্নীত করা হয়। তবে ১০০ মিলিয়ন টাকার উর্ধ্বে বিনিয়োগের জন্য জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের অনুমোদন লাভ আবশ্যকীয় করা হয়।

(খ) বেসরকারি উদ্যোক্তাগণকে প্রণোদিত করার উদ্দেশ্যে রাজস্ব ও আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের কথা ঘোষণা করা হয়।

(গ) আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে শিল্প বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয়করণের প্রতি জোর দেয়া হয়।

(ঘ) পরবর্তী ১৫ বছর পর্যন্ত জাতীয়করণ করা হবে না বল ঘোষণা করা হয়।

(ঙ) শিল্প ইউনিটসমূহের জন্য কর অবকাশের ঘোষণা দেয়া হয়।

(চ) উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মুদ্রার অবমূল্যায়ন করা হয়।

(ছ) বিদেশী বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদানের কথা ঘোষণা করা হয় (শিল্পনীতি ১৯৭৫)

সরকারের এ সকল নীতিমালা যথাযথভাবে কার্যকরী হবার পূর্বেই ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের শিল্প খাতে বিরাষ্ট্রীয়করণ অধ্যায় শুরু হয়। বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ছিল ঃ

(ক) বেসরকারি বিনিয়োগের সীমা প্রত্যাহার

(খ) বিনিয়োগ প্রক্রিয়া সহজীকরণ;

(গ) বিরাষ্ট্রীয়করণ অধ্যাদেশ জারী;

(ঘ) পুঁজিবাজারের পুনর্জীবন ;

(ঙ) স্থির বিনিময় হতে ব্যবস্থাপিত চলমান বিনিময় হারে পরিবর্তন;

(চ) রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ (বায়েস ও অন্যান্য, ১৯৯৮)

কিন্তু বিরাষ্ট্রীয়করণের এ পদক্ষেপসমূহও শিল্পখাতকে গতিশীল করতে ব্যর্থ হয়। এর কারণ বহুবিধ। প্রথমতঃ বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত শিল্পসমূহকে শুধু নামমাত্র দামেই বিক্রি করা হয় নাই উপরন্ত রাজনৈতিক সুবিধাভোগী দলীয় এমন সব কর্মীদের কাছে বিক্রি করা হয় যাদের ন্যূনতম 'entrepreneurial ability' ছিল না। অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা নয় বরং দলীয়করণই ছিল শিল্প বিরাষ্ট্রীয়করণের মূলনীতি। এছাড়া এসকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্রেতাগণকে ঋণ সুবিধাসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা ও আন্তরিকতার অভাবে এ মালিকগণ এ সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ব্যর্থ হয়, এবং অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান রুগ্ন হয়ে পড়ে। শিল্পের রুগ্নতার সুযোগে মালিকগণ ব্যাংক থেকে পুনরায় ঋণ নিতে থাকে কিন্তু শিল্পকে গতিশীল করতে ব্যর্থ হয়। ফলে তারা ঋণ পরিশোধেও ব্যর্থ হয়। এভাবেই আমাদের সমাজে ঋণ খেলাপী শ্রেণীর আবির্ভাব হয়।

সামগ্রিকভাবে দেখা যায়, নীতিমালায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হলেও ৭০-এর দশকে শিল্পখাত ছিল মোটামুটি স্থবির যা নিম্নের সারণী হতে স্পষ্ট। এ দশকে জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান কমলেও শিল্পখাতের অবদান খুব একটা পরিবর্তীতে হয় নাই। নীতিমালার সুষ্ঠু প্রয়োগের অভাবে এ দশকে শিল্পখাতের এ স্থবিরতা স্থায়ী রূপ ধারণ করে। বিআইডিএস এর উদ্যোগে সোবহান ও আহসান (১৯৮৪) বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত শিল্প ইউনিট সমুহের উপর এক সমীক্ষা চালান। গবেষণায় দেখা যায় যে, ১৯৭৬-১৯৮৩ সাল পর্যন্ত বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত শিল্প ইউনিটসমূহের মধ্যে নমুনায়নে ব্যবহৃত ৩৫টির মধ্যে ১৯টির উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, ১১টিতে উৎপাদন হ্রাস পায় এবং ৫টি শিল্প স্থাপনা বন্ধ হয়ে যায়। নমুনাকৃত শিল্পগুলোর মধ্যে মাত্র ৮টির মুনাফা বৃদ্ধি পায়, অন্যগুলোর অবস্থা পূর্বের চেয়ে খারাপ হয়। এছাড়া বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত শিল্পসমূহে শ্রমিক ছাঁটাই হতে থাকে এবং সরকারি ঋণ পরিশোধেও এ প্রতিষ্ঠানসমূহ হতাশাজনক পারফরমেন্স প্রদর্শন করে। সুতরাং ৭০ এর দশকের শেষভাগের বিরাষ্ট্রীয়করণ মিশ্র ফলাফল নির্দেশ করে।

সারণী-২ ঃ ১৯৭২/৭৩ সালের স্থির দামে ১৯৭৩/৭৪-১৯৮১/৮২ সময়ে বাংলাদেশের জিডিপি গঠন ও প্রবৃদ্ধি

(মিলিয়ন টাকা)

বছর/খাত	কৃষি	শিল্প	অন্যান্য	জিডিপি
১৯৭৩/৭৪	২৮৮২৭ (৫৭.০)	৩৪০২ (৬.৭)	১৮৩৪০ (৩৬.৩)	৫০৫৬৯ (১০০)
১৯৭৪/৭৫	২৮৫৩৭ (৫৪.৬)	৫৪৮১ (১০.৫)	১৮২৬৪ (৩৪.৯)	৫২২৮২ (১০০)
১৯৭৫/৭৬	৩১৯৬৫ (৫৪.৩)	৫৮৭৭ (১০.০)	২০৯৪৪ (৩৫.৭)	৫৮৬৮৬ (১০০)
১৯৭৬/৭৭	৩০৯০৩ (৫২.০)	৬১১৭ (১০.৩)	২২৪৪৯ (৩৭.৭)	৫৯৪৬৯ (১০০)
১৯৭৭/৭৮	৩৪০১৯ (৫৩.২)	৬৬৪১ (১০.৩)	২৩৩২২ (৩৬.৫)	৬৩৯৮২ (১০০)
১৯৭৮/৭৯	৩৩০৮২ (৫০.০)	৭০৬৫ (১০.৭)	২৬০৮০ (৩৯.৩)	৬৬২২৭ (১০০)
১৯৭৯/৮০	৩৩১৩৬ (৪৪৯.৪)	৭২১০ (১০.৮)	২৬৭.৪৯ (৩৯.৮)	৬৭০.৯৫ (১০০)
১৯৮০/৮১	৩৪৯.৯০৮ (৪৮.৭)	৭৬০২ (১০.৬)	২৯১.৩৪ (৪০.৭)	৭১৬.৪৪ (১০০)

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, বিভিন্ন সংখ্যা।

নোট ঃ বন্ধনীয় সংখ্যাসমূহ জিডিপিতে খাতের অবদান নির্দেশ করছে।

৪.০ ১৯৮০ এর দশকে বাংলাদেশের শিল্পখাত

১৯৮০ এর দশকে পরিবর্তিত বিশ্ব প্রক্রিয়ার সাথে মিল রেখে বিশ্বব্যাংক ও আই. এম. এফ উন্নয়নশীল দেশসমূহ উন্নয়নের নতুন কৌশল হিসেবে বাজারমুখী অর্থনৈতিক

সারণী-২ ঃ ১৯৭২/৭৩ সালের স্থির দামে ১৯৭৩/৭৪-১৯৮১/৮২ সময়ে বাংলাদেশের জিডিপি গঠন ও প্রবৃদ্ধি

(মিলিয়ন টাকা)

বছর/খাত	কৃষি	শিল্প	অন্যান্য	জিডিপি
১৯৭৩/৭৪	২৮৮২৭ (৫৭.০)	৩৪০২ (৬.৭)	১৮৩৪০ (৩৬.৩)	৫০৫৬৯ (১০০)
১৯৭৪/৭৫	২৮৫৩৭ (৫৪.৬)	৫৪৮১ (১০.৫)	১৮২৬৪ (৩৪.৯)	৫২২৮২ (১০০)
১৯৭৫/৭৬	৩১৯৬৫ (৫৪.৩)	৫৮৭৭ (১০.০)	২০৯৪৪ (৩৫.৭)	৫৮৬৮৬ (১০০)
১৯৭৬/৭৭	৩০৯০৩ (৫২.০)	৬১১৭ (১০.৩)	২২৪৪৯ (৩৭.৭)	৫৯৪৬৯ (১০০)
১৯৭৭/৭৮	৩৪০১৯ (৫৩.২)	৬৬৪১ (১০.৩)	২৩৩২২ (৩৬.৫)	৬৩৯৮২ (১০০)
১৯৭৮/৭৯	৩৩০৮২ (৫০.০)	৭০৬৫ (১০.৭)	২৬০৮০ (৩৯.৩)	৬৬২২৭ (১০০)
১৯৭৯/৮০	৩৩১৩৬ (৪৪৯.৪)	৭২১০ (১০.৮)	২৬৭.৪৯ (৩৯.৮)	৬৭০.৯৫ (১০০)
১৯৮০/৮১	৩৪৯.৯০৮ (৪৮.৭)	৭৬০২ (১০.৬)	২৯১.৩৪ (৪০.৭)	৭১৬.৪৪ (১০০)

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, বিভিন্ন সংখ্যা।

নোট ঃ বন্ধনীয় সংখ্যাসমূহ জিডিপিতে খাতের অবদান নির্দেশ করছে।

৪.০ ১৯৮০ এর দশকে বাংলাদেশের শিল্পখাত

১৯৮০ এর দশকে পরিবর্তিত বিশ্ব প্রক্রিয়ার সাথে মিল রেখে বিশ্বব্যাংক ও আই. এম. এফ উন্নয়নশীল দেশসমূহ উন্নয়নের নতুন কৌশল হিসেবে বাজারমুখী অর্থনৈতিক

সংস্কারের প্রতি মনোযোগ দানের পরামর্শ প্রদান করে। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ কাঠামোগত সমন্বয় নীতিসমূহ (Structural Adjustment Policies) গ্রহণ করে। এ নীতির আওতায় সরকার ১৯৮২ সালের ১লা জুন বেসরকারি খাতকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান ও সরকারি খাতকে সীমিতকরণের অংগীকার ব্যক্ত করার মাধ্যমে নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করে। এ শিল্পনীতির প্রধান দিকগুলো ছিল ঃ

(ক) সরকারি খাতের শিল্পসমূহের ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের লক্ষ্যে এগুলোর মেরামত;

(খ) সংযোজন শিল্প হতে ক্রমান্বয়ে কলকব্জার নির্মাণ শিল্প গড়ে তুলতে পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান;

(গ) রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করা;

(ঘ) দক্ষ ও লাভজনক আমদানী বিকল্প শিল্প সমূহকে সংরক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদনে উৎসাহিত করা;

(ঙ) বেসরকারি খাতের বর্ধিত অংশ গ্রহণের মাধ্যমে শিল্পায়নের গতি ত্বরান্বিত করা;

(চ) সরকারি খাতকে মূল ও ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা;

(ছ) শুল্ক কাঠামোর যৌক্তিকীকরণ; এবং যথাযথ রাজস্ব প্রণোদনা প্রদান। শিল্প নীতি-১৯৮২);

উপরোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণ করার লক্ষ্যে ব্যাপক বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়। এ সময়ে পাট ও বস্ত্র খাতের অনেক শিল্প ইউনিটকে বেসরকারি খাতে হস্তান্তর করা হয়। বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত শিল্প ইউনিটের সংখ্যা ১৯৮২ সালের ১১৬ থেকে ১৯৮৩ সালে ২১৭টিতে উন্নীত হয়। এবং ১৯৮৬ সালের জুনে এ সংখ্যা ৪৮২তে উন্নীত হয়। বিরাষ্ট্রীয়করণের মূল লক্ষ্য ছিল রুগ্ন ও অলাভজনক শিল্প ইউনিটসমূহকে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দিয়ে এগুলোকে লাভজনক করা এবং ব্যাপক ভর্তুকী এড়ানো। কিন্তু বেসরকারিকরণের এ প্রক্রিয়ায়ও সরকার দলীয়করণের উর্ধ্বে উঠতে ব্যর্থ হয়। দৃঢ় রাজনৈতিক অংগীকারের অভাবে তৎকালীন সামরিক সরকার তার অবস্থানকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে দলীয় সুবিধাভোগীদের কাছে নামমাত্র মূল্যে শিল্প হস্তান্তর করে। শুধুমাত্র অলাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহই নয় লাভজনক সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকেও ব্যাপকভাবে বেসরকারি মালিকানায় হস্তান্তর করা হয়। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়

যে, ১৯৮২ সালের জুন মাসের আগে বিক্রয়কৃত কারখানাগুলোর মধ্যে লাভজনক শিল্প ইউনিটের সংখ্যা ছিল ৩২% এবং এরশাদ আমলে এ সংখ্যা হচ্ছে ৭৮% (আকাশ০১৯৮৪, পৃষ্ঠা ১১)। এ নব্য শিল্প মালিকগণ শিল্প পরিচালনার নামে ব্যাংক থেকে কোটি কোটি টাকা গ্রহণ করেছে কিন্তু পরিচালনগত দক্ষতা না থাকায় তাদের পদক্ষেপ সফলতা লাভ করেনি বরং অনেক চালু শিল্প কারখানা রুগ্ন হয়ে পড়ে। এ রুগ্ন শিল্প গুলোকে বাঁচানোর লক্ষ্যে নব্য শিল্প মালিকগণ পুনরায় ব্যাংক ঋণের দারস্থ হন। কিন্তু এ টাকা রুগ্ন শিল্পোন্নয়নের কাজে না লাগিয়ে অভিজাত এলাকায় বাড়ী করেছে, লেটেস্ট মডেলের গাড়ী কিনেছে নিজিদের সন্তানদের শিক্ষার নাম করে বিদেশে পাঠিয়েছে। ফলে রুগ্ন শিল্প অরো রুগ্ন হয়েছে এবং বাংলার সমাজে ঋণ খেলাপী, লুটেরা শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। যারা জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং দেশের শিল্প, সংস্কৃতি প্রভৃতিকে বিনষ্ট করে দেশের উন্নয়নের পথে অপতৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। ১৯৮৩-১৯৮৮ সময়ে বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত পাট শিল্পসমূহের উপর ভাস্কর ও মুশতাক (১৯৯৫) এক গবেষণা পরিচালনা করেন। এ গবেষণায় তাঁরা দেখান যে, বিরাষ্ট্রীয়করণে নীতি শিল্প কারখানার ম্যানেজারিয়াল এবং স্থায়ী শ্রমিকের উপর বড় ধরনের ঋণাত্মক প্রভাব ফেলে অন্যদিকে নৈমিত্তিক শ্রমিকের কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে যথার্থ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া ৮০-এর দশকে বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত শিল্প ইউনিটসমূহের উপর বিনায়ক সেন (১৯৯৭) এক সমীক্ষা পরিচালনা করেন। উক্ত সমীক্ষা হতে দেখা যায় যে, ৪০ শতাংশ বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে যায় এবং মোট সংখ্যার ৫ শতাংশের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় নাই। যদিও বন্ধ হয়ে যাওয়া বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত শিল্পসমূহের অর্ধেকেরও বেশীর পারফরমেন্স বিরাষ্ট্রীয়করণের পূর্বে সন্তোষজনক ছিল। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানসমূহের বন্ধের কারণ হিসেবে বিরাষ্ট্রীয়করণকে দায়ী করা যায় না। অন্যান্য বিষয় যেমন পূঁজির অপ্রতুলতা, ঋণের বোঝা, উদ্যোক্তার অদক্ষতাকেও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। তবে বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত শিল্প ইউনিটসমূহের মধ্যে যেগুলো বাজার চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে নতুন নতুন দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করেছে সেগুলো অপেক্ষাকৃত ভাল পারফরমেন্স প্রদর্শন করেছে। তথাপি এ দশকে বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতি কর্ম সংস্থান ২৫% হ্রাস করেছে।

সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, বিশ্বব্যাংক ও আই এম এফ-এর সুপারিশ মোতাবেক পরিচালিত কাঠামোগত সমন্বয় নীতির আওতায় বাংলাদেশের ১৯৮২ সালের

শিল্পনীতি শিল্পখাতে গতিশীলতা আনতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেনি (সারণী পঃ ১,২,৩)। তবে এ সময়ের উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে তৈরী পোষাক শিল্পের ব্যাপক বিকাশ (সারণী ঃ পঃ ৫)। এ শিল্প একদিকে যেমন বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করছে (সারণী প ঃ ৬); তেমনি অন্যদিকে বিপুল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

৫.০ ১৯৯০ এর দশকে বাংলাদেশের শিল্পখাত

১৯৮০ এর দশকের ধারাবাহিকতায় প্রণীত ১৯৯১ সালের শিল্পনীতিকে বাংলাদেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১৯৯১ সালে নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ক্ষমতায় আসীন হন। এ সরকার শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে গতিশীল করার লক্ষ্যে অধিকতর বাজারমুখী উদারনীতি গ্রহণ করে। ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে প্রণোদিত করার উদ্দেশ্যে শিল্প ঋণের সুদের হার হ্রাস করে এবং শিল্পোদ্যোক্তাদের ঋণ সুবিধা প্রদান করে এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য নীতিমালা সহজ করে। এ শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ছিল অধিকতর রপ্তানী নির্ভর। দেশী বিদেশী অনেক প্রতিষ্ঠান সরকারি নীতিমালায় প্রণোদিত হয়ে শিল্প বিনিয়োগে এগিয়ে আসে। (সারণী ৭ ও ৮) তবে বিদেশী প্রতিষ্ঠানসমূহ কৃষিভিত্তিক ও ভারী শিল্পসমূহের পরিবর্তে সেবামূলক শিল্পসমূহে অধিকতর বিনিয়োগ করে (সারণী ৮)।

এ সময়ে আমদানী প্রক্রিয়াকে উদারীকরণ করা হয়; আমদানীর উপর থেকে বিভিন্ন ধরনের শুল্ক ও শুল্ক বহির্ভূত বাধাসমূহ অপসারণ করা হয়। এর ফলে শিল্প উপকরণ সমূহের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকারের ভোগ্যদ্রব্য অবাধে আমদানী হতে থাকে (সারণী ১১) এবং বিলাস দ্রব্যসমূহও আমদানী হতে থাকে। মুক্ত বাজার অর্থনীতির অধীনে আগত বিদেশী দ্রব্যসমূহ দেশীয় বাজার পুরোপুরি দখল করে নেয়। এবং দেশীয় পণ্যসমূহ গুণগতমান নিম্নমানের কারণে বিদেশী দ্রব্যসমূহের কাছে মার খেতে থাকে। ফলে দেশীয় শিল্পসমূহ রুগ্ন হতে থাকে। আবার বিদেশী এ সকল পণ্য নকলের মাধ্যমে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী বাজার দখল করতে থাকে, ফলে ক্রেতা সাধারণ প্রতারিত হতে থাকে।

আবার ১৯৯১-৯৫ সময়কালে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের অংগীকার থাকলেও অবনতিশীল আইন শৃংখলা পরিস্থিতি শিল্পখাত কতিপয় অর্থনৈতিক কারণে উল্লেখযোগ্য গতিশীলতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়। উদাহরণস্বরূপ এ সময়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সম্পর্ক এমন খারাপ হয় যে কোন মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিলে অন্য মন্ত্রণালয় তা বাতিল করতে দ্বিধা বোধ করতো না। এছাড়া দলীয়কর্মীদের সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি এমন স্তরে উন্নীত হয় যে প্রকৃত উদ্যোক্তাগণ শিল্প বিনিয়োগে অনুৎসাহিত হয়। ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৯০ দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত ২০০টি শিল্প ইউনিটের উপর তানবীর আকরাম (১৯৯৮) এক গবেষণা পরিচালনা করেন। গবেষণায় তিনি দেখান যে, বেসরকারি শিল্প ইউনিটসমূহের ঋণের বোঝা সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রায় দ্বিগুণ। ঋণের ক্রমপুঞ্জিতা, ব্যবস্থাপনাগত অদক্ষতা, বাংলাদেশের বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত শিল্পসমূহের হতাশাজনক পারফরমেন্সের মূল কারণ। এছাড়া ১৯৯১-১৯৯৬ সালে বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত ১৩টি শিল্প ইউনিটের উপর বিশ্বব্যাংক এক গবেষণা পরিচালনা করে। এ গবেষণা হতে দেখা যায় যে, বিরাষ্ট্রীয়করণের পরে ১৩টি ইউনিটের মধ্যে ৭টির মাসিক মুনাফা ১৮৫% বৃদ্ধি পেয়েছে, ৩টি ইউনিটের মোট উৎপাদন ১৫% এবং গড় শ্রম উৎপাদনশীলতা ৭১% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একক প্রতি খরচ ২১% হ্রাস পেয়েছে। ৬টি ইউনিটের সামর্থ ব্যবহার ৩% বেড়েছে এবং ৭টি প্রতিষ্ঠানের মোট বিক্রয় রাজস্ব ৭৭% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ৯টি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ ১৮% বেড়েছে। সমীক্ষা হতে আরো দেখা যায় যে, ৩টি প্রতিষ্ঠান অলাভজনক অবস্থান থেকে লাভজনক অবস্থানে উন্নীত হয়েছে এবং কেবলমাত্র ২টি প্রতিষ্ঠানের অবস্থা পূর্বের চেয়ে খারাপ হয়েছে। উপরোক্ত ফলাফলের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাংক বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়া দ্রুততর করার প্রতি জোর দিয়েছে।

১৯৯০ এর দশকের শেষার্ধে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসে এবং শিল্পোন্নয়নে পূর্ববর্তী সরকারের নীতি অনুসরণ করে। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার মুদ্রা বাজারের সংকট, বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় মন্দাভাব আমাদের আমদানী উপকরণের উর্ধ্বগতি এবং বিশ্ববাজারে রপ্তানী ব্যয়ের নিম্নগতির ফলে বিগত কয়েক বছরে শিল্পখাত চরম হতাশাজনক পারফরমেন্স প্রদর্শন করে। এছাড়া ১৯৯৮ সালের প্রলয়ংকরী বন্যা শিল্পখাতকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। এফ.বি.সি.সি আই এর এক সমীক্ষা মতে

১৯৯৮ সালের বন্যায় ৫০০ শিল্প ইউনিটকে ক্ষতিগ্রস্ত করে যেখানে ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৪২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১৮.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং গার্মেন্টস শিল্পসমূহে ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো-৯৯৮) তবে সরকারের নীতিমালার কারণে শিল্পখাতে স্থানীয় এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের নতুন দিগন্ত সূচিত হয়েছে।

শিল্পখাতে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সরকার নতুন শিল্পনীতি ১৯৯৯ অনুমোদন করেছে যার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে ঃ

(ক) আগামী এক দশকে মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগ শিল্প খাত থেকে যোগান দেয়ার এবং মোট শ্রমশক্তির ২০ ভাগ শিল্পখাতে নিয়োজিত করা;

(খ) একটি গতিশীল বেসরকারি খাত সৃষ্টি করা যা শিল্পায়ন ও বিনিয়োগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে;

(গ) শিল্প স্থাপনে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা;

(ঘ) শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান;

(ঙ) বিদ্যমান উৎপাদন ক্ষমতার সর্বাত্মক ব্যবহার;

(চ) শিল্প পণ্যের বহুমুখীকরণ ও দ্রুত রপ্তানী বৃদ্ধি;

(ছ) রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় অবস্থিত শিল্পসমুহে ১০ বছরের জন্য আয়কর রেয়াত এবং ১০ বছর পর রপ্তানী আয়ের উপর শতকরা ৫০ ভাগ আয়কর রেয়াত প্রদান;

(জ) রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় উপকরণ সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে পশ্চাদ সংযোগ শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করা ইত্যাদি (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ ১৯৯৯)।

এছাড়া, সরকার প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে (মংলা, ঈশ্বরদী, সৈয়দপুর, কুমিল্লা) আরো রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং বিভিন্ন প্রণোদনা নীতি প্রণয়ন করেছে এবং বেসরকারি

উদ্যোগে রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়েছে। এছাড়া, সফটওয়্যার শিল্প ও কৃষিপণ্য এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ খাতের শিল্পকে উৎসাহিত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে একটি সম মূলধন ও উদ্যোগ তহবিল প্রতিষ্ঠা করেছে। ১৯৯০ এর দশকে শিল্পখাতের উল্লেখ্যযোগ বৈশিষ্ট হচ্ছে বর্ধিত হারে বেসরকারিকরণ। এ সময় সরকার ৩৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তর করেছে এবং আরো শিল্প ইউনিট এ প্রক্রিয়ার আওতায় এসেছে। নব্য বেসরকারি করণকৃত শিল্প ইউনিটসমূহের পারফরমেন্স পরিমাপের জন্য সরকারি উদ্যোগে কোন গবেষণা পরিচালনা করা হয় নাই। অন্যদিকে, বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত গবেষণার ফলাফল মিশ্র।

এছাড়া, এ সময়ে সরকার প্রথমবারের মত শ্রমিক কর্মচারিদের স্বার্থ বিবেচনা করে ৮টি বস্ত্রকল শ্রমিক কর্মচারিদের নিকট হস্তান্তর করেছে এবং আরো একটি বস্ত্রকল ও ১টি পাটকল হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে, ১৯৯০ এর দশকের দ্বিতীয় ভাগ অপেক্ষা প্রথম ভাগে শিল্পখাত ধনাত্মক পারফরমেন্স প্রদর্শন করে। ১৯৯১ সালে গঠিত নতুন সরকার পূর্ববর্তী সরকারের ব্যর্থতাকে অতিক্রম করে অর্থনীতির দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিল্পখাতে গতিশীলতা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ ১৯৯২-১৯৯৬ সময়কালে শিল্পখাতে বাংলাদেশের বহিঃ বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে অবস্থান গড়ে নিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ১৯৯৬ সালে গঠিত সরকার পূর্ববর্তী সরকারের গতিমান প্রক্রিয়াকে ধরে রাখতে সমর্থ হয়নি। এ দশকের শিল্প পণ্য এবং শিল্প উপকরণের আমদানী ও রপ্তানী কাঠামো থেকে ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট হয়ঃ

সারণী -৩ ঃ শিল্প পণ্যের আমদানী কাঠামো ১৯৯১-২০০০

(মিলিয়ন ইউ, এস ডলার)

আইটেম	'৯১	'৯২	'৯৩	'৯৪	'৯৫	'৯৬	বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার (১৯৯২-১৯৯৬)	'৯৭	'৯৮	'৯৯	'২০০০	বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার (১৯৯৬-২০০০)
শিল্প উপকরণ	৬৯০	৬৭৯	৬৩৮	৭১৩	৯২৪	১০৭৬	১০.০৩	১৩০৩	১১৪৬	১১০৪	১২২৫	৪০৯
পুঁজি দ্রব্যসমূহ	১২৩১	১২৮৯	১৩৪৬	১৩০০	১৬৮৮	১৯৬৮	১০.৪৩	১৯৩৭	২০৭২	১৯৬৯	২১৩৩	২.১৯

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০২।

সারণী -৪ ঃ শিল্প পণ্যের রপ্তানী কাঠামো ১৯৯১-২০০০

(মিলিয়ন ইউ, এস ডলার)

দ্রব্যসমূহ	'৯১	'৯২	'৯৩	'৯৪	'৯৫	'৯৬	বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ১৯৯২ ১৯৯৬	'৯৭	'৯৮	'৯৯	'২০০০	'২০০১	বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ১৯৯৬-২০০০
পাটজাত দ্রব্য	২৯০	৩০১	২৯২	২৮৪	৩১৯	৩২৯	২.৭০	৩১৮	২৮১	৩০৪	২৬৬	২৩০	-৬.৫৪
চামড়া	১৩৪	১৪৪	১৪৮	১৬৮	২০২	২১২	৯.৭৯	১৯৫	১৯০	১৬৮	১৯৫	২৫৪	৪.৮৩
উভেন আর এমজি	৭৩৬	১০৬৪	১২৪০	১২৯২	১৮৩৫	১৯৪৯	২২.৭১	২২৩৮	২৮৪৩	২৯৮৫	৩০৮৩	৩৩৬৪	১১.৮৫
নীট আর এমজি	১৩১	১১৯	২০৫	২৬৪	৩৯৩	৫৯৮	৩৮.৫৮	৭৬৩	৯৪০	১০৩৫	১২৭০	১৪৯৬	২০২৮
রাসায়নিক	৪০	২৫	৫৫	৫৪	১০৮	৯৮	৩৪.২৮	১০৮	৭৪	৭৯	৯৪	৯৭	১.৫৭

উৎস ঃ বার্ষিক রপ্তানী আয় (১৯৯০-৯১ হতে ১৯৯৮-৯৯) পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৬.০ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম

ছয়টি শিল্প কর্পোরেশনের অধীনে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশের শিল্প খাতের গতিশীলতার পথে অন্যতম অন্তরায় হিসেবে বিরাজ করছে। এ শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ দেশের মোট শিল্পের স্থির সম্পদের ৯২ শতাংশ দখল করে আছে। কিন্তু সাংগঠনিক দুর্বলতা, অদুরদর্শিতা, অনভিজ্ঞ পরিচালনা, ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা, কর্তা ব্যক্তিদের দুর্নীতি, ট্রেড-ইউনিয়নসমূহের অবাঞ্ছিত কার্যক্রমের ফলে এ সকল প্রতিষ্ঠান অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এসকল প্রতিষ্ঠান গড়ে প্রতিবছর ১০০ কোটি টাকা নীট লোকসান দিচ্ছে এবং ব্যাংক ঋণের সাহায্যে টিকে আছে। এসকল কর্পোরেশনের মোট খেলাপী ঋণের পরিমাণ, ১৯৯৮/৯৯ সালের হিসেবে, ১৪৮৭.৪৯ কোটি টাকা। (সারণী ৯ ও সারণী ১০)। গত ২ নভেম্বর ২০০০ সালে সংবাদে প্রদত্ত অর্থমন্ত্রীর এক তালিকা থেকে দেখা যায় যে, ১৯৯৯ সালের জুন পর্যন্ত খেলাপী ঋণের তালিকায় শীর্ষস্থানে আছে সরকারি খাতের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন (বি.টি.এম.সি) যার খেলাপী ঋণের পরিমাণ ৬ শত ৩ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। এর পরেই আছে সরকারি খাতের আরেক প্রতিষ্ঠান চিটাগাং স্টিল মিলস লিমিটেড যার খেলাপী ঋণের পরিমাণ ৫ শত ৪২ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা। সরকারি খাতের এ প্রতিষ্ঠানসমূহ শিল্প খাতকেই স্থবির করছে না উপরন্তু ব্যাংকিংসহ অন্যান্য খাতেও ঋণাত্মক প্রভাব ফেলছে। বিশ্বব্যাংকের এক রিপোর্ট মতে ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে ১৫৫টি রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানের মোট লোকসানের পরিমাণ ছিল ১০.৭৩ বিলিয়ন টাকা (এডিপির ১২% এবং জিডিপির ১.২%)। ১৯৯৫ এবং ১৯৯৭ সালে এ পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭.৪ বিলিয়ন এবং ৮.৩ বিলিয়ন। বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট থেকে আরো জানা যায় রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে সর্বমোট ২,৫৯,০০০ জন কর্মী নিয়োজিত রয়েছেন যাদের প্রত্যেকের জন্য বছরে ব্যয় হয় ৫৪,০০০-১,৬৭,০০০ টাকা। এবং এসব প্রতিষ্ঠানে উদ্বৃত্ত কর্মীর সংখ্যা ২০-৫০ শতাংশ। তীব্র লোকসানের কারণে এসকল প্রতিষ্ঠানের নীট সম্পদ ঋণাত্মক হয়ে পড়েছে। ফলে এসকল প্রতিষ্ঠানসমূহ শুধুমাত্র সরকারি বাজেট বরাদ্দ এবং রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকসমূহ থেকে গৃহীত ঋণের মাধ্যমে টিকে আছে। কিন্তু চূড়ান্তভাবে এ ঋণ কুঋণে পরিণত হয় যা রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকসমূহকে আর্থিকভাবে দুর্বল করে দেয়। বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টে দেখা গেছে ১৯৯৩ সালে রাস্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের ঋণের ৫০ শতাংশই রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ব্যয় করা হয়েছে। ব্যাংক ব্যবস্থা

থেকে সরকারের এই বিপুল পরিমাণ ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত করেছে।

সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের এই বিরাট লোকসানের কারণ বহুবিধ। প্রধান কারণগুলো হচ্ছে উপযোগ সেবাসমূহ যেমন বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, প্রভৃতির ব্যাপক সিস্টেম লস্ এবং উদ্ধৃত্তকর্মী ও অপচয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে লোকসানী এ প্রতিষ্ঠানসমূহকে কতদিন এভাবে বাঁচিয়ে রাখা হবে? এ প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ। এ প্রতিষ্ঠানসমূহকে ভর্তুকীর মাধ্যমে বেশীদিন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে না এবং দিনে দিনে এ প্রতিষ্ঠানসমূহ আমাদের জন্য দুর্দশাই বয়ে আনবে। তাই এ ব্যবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ হচ্ছে অনতি বিলম্বে এগুলোর বেসরকারিকরণ। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায় যে, ১৯৭৫-৭৬ সাল থেকেই মূলতঃ সরকার বেসরকারিকরণের প্রতি মনোনিবেশ করেছে এবং কিছু প্রতিষ্ঠানকে ইতিমধ্যে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু নতুন বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত শিল্প ইউনিটসমূহের উৎপাদন প্রক্রিয়া তথা পাফরমেন্স বিষয়ে সরকার কোন দৃষ্টি দেয়নি। উপরন্তু বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত মন্থর, ১৯৯০-১৯৯৯ সাল পর্যন্ত সরকার মাত্র ৩৩টি প্রতিষ্ঠানকে ব্যক্তিগত উদ্যোক্তার হাতে ছেড়ে দিয়েছে। একটি সফল বিরাষ্ট্রীয়করণ কর্মসূচি পাঁচটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে (ক) উত্তম প্রস্তুতি (খ) সর্বসাধারণের সমর্থন লাভ (গ) সঠিক বিক্রয় প্রক্রিয়া (ঘ) সঠিক ব্যবস্থাপনা (ঙ) অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত কর্মী ছাঁটাইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকা (কুদ্দুস-৯৬)। কিন্তু বাংলাদেশে বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়া গ্রহণের সময় উক্ত বিষয়গুলোর প্রতি প্রয়োজনীয় মনোনিবেশ করা হয়নি।

৭.০ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন কার্যক্রম

গ্রামীণ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) বেকারত্ব হ্রাস, মহিলাদের কর্মসংস্থান এবং নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে ধনাত্মক ভূমিকা পালন করছে। বিসিকের এক উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, ১৯৯৩/৯৪ সালের বিসিকের শিল্প উদ্যোক্তার সংখ্যা ১১,৯৭৭ হতে ১৯৯৭/৯৮ সালে ২৫,১৯১ এ বৃদ্ধি পেয়েছে। এসময়ে অন্য কোন সমীক্ষায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংখ্যা ৯,৭৫৪ হতে ১৬,৬৪২ টিতে বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে কর্মসংস্থানের সংখ্যা ৫০,৮৭৩ হতে ৮১,৫২১ এ উন্নীত হয় (বাংলাদেশ

অর্থনৈতিক জরিপ, ১৯৯৯)। কিন্তু উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা এবং ঋণ সুবিধা ও শ্রমিকের প্রশিক্ষণ এবং ন্যায্য মজুরী নিশ্চিত না করার কারণে এ খাত যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

৮.০ বাংলাদেশের শিল্পখাতের বিকাশের পথে মূল অন্তরায়সমূহ এবং তাদের সমাধানের উপায়

স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভর অর্থনীতি গড়ার স্বপ্নকে সামনে রেখে বাংলাদেশের শিল্পখাতে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এসকল নীতিমালার বাস্তবায়নে যে ধরনের দৃঢ় রাজনৈতিক অংগীকারের প্রয়োজন ছিল তা কোন সরকারই যথাযথভাবে প্রদর্শন করতে পারেনি। এ কারণে একদিকে দেশের সমগ্র অর্থনীতির উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে আছে অলাভজনক রাষ্টায়ত্ত শিল্প কর্পোরেশনসমূহ এবং অন্যদিকে বিদ্যমান রয়েছে অদক্ষ, দুর্বল ও রুগ্ন বেসরকারি শিল্পসমূহ। আবার তৈরী পোষাক শিল্প দ্রুত প্রসার লাভ করলেও এসকল প্রতিষ্ঠানের পশ্চাদ সংযোগকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে না তোলার কারণে এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নতুন নতুন নীতিমালার ফলে এ শিল্পও হুমকির সম্মুখীন। অন্যদিকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসমূহ অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও সরকারের অদূরদর্শিতার কারণে এ শিল্পসমূহ হতাশাজনক পারফরমেন্স প্রদর্শন করেছে। সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে বাংলাদেশের শিল্প খাতের স্থবিরতার মূল কারণ দক্ষ উদ্যোক্তা শ্রেণীর অভাব। একজন উদ্যোক্তা শুধুমাত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপাকর ভূমিকাই পালন করে না তাকে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকিও গ্রহণ করতে হয়। উদ্যোক্তা ও শিল্প ব্যবস্থাপকের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে, উদ্যোক্তা ঝুঁকি গ্রহণ করতে রাজী থাকেন কিন্তু ব্যবস্থাপক থাকেন না। বাংলাদেশের জনগণ সামাজিকভাবে ঝুঁকি বিমুখ, এই ঝুঁকি বিমুখতা তাদেরকে বিনিয়োগে প্রণোদিত করেনা। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কেউ ঝুঁকি গ্রহণে রাজী থাকেন কিন্তু তার মূলধন কিংবা কারিগরী জ্ঞানের অভাব থাকে। সে ক্ষেত্রে তাকে এসকল সমস্যা মোকাবেলার সুযোগ দেয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তাই শিল্প খাতের গতিশীলতা আনার জন্য দেশে উদ্যোক্তা শ্রেণী সৃষ্টি খুবই জরুরী (Schumpeter 1978)।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশে শিল্প বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে আছে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য দ্রুত ও সকল প্রতিষ্ঠানের মূল সমস্যা যেমন-ব্যবস্থাপনার

দুর্বলতা, উদ্বৃত্ত শ্রমিক, পুরোনো যন্ত্রপাতি, দুর্নীতি, ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম ইত্যাদি দূর করার লক্ষ্যে কার্যকরী সংস্কার কমিটি গঠন করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন দৃঢ় রাজনৈতিক অংগীকার। নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার দেশের ভবিষ্যৎ স্বার্থের কথা চিন্তা করে দ্রুত এ সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

বিদ্যুৎসহ অন্যান্য অবকাঠামোর উন্নয়ন শিল্প খাতের বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হলেও বিদ্যুৎখাতে যথেষ্ট উন্নতি লাভে সমর্থ হয় নাই। শিল্পখাতের বিকাশে সরকার বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে যত্নবান হতে পারে। দেশে কারিগরী জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে শিল্পখাতে বিদ্যুৎসহ অন্যান্য অবকাঠামোর উন্নয়ন শিল্প খাতের বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হলেও বিদ্যুৎখাতে যথেষ্ট উন্নতি লাভে সমর্থ হয় নাই। শিল্পখাতের বিকাশে সরকার বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে যত্নবান হতে পারে। দেশে কারিগরী জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে শিল্পখাতে স্থবিরতা বিরাজ করছে এবং অনেক সময় প্রচুর অর্থ ব্যয় করে বিদেশ থেকে উপদেষ্টা নিয়োগ করতে হয়। এ অবস্থার অবসানের লক্ষ্যে শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট স্থাপন আবশ্যক।

জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির ফলে মানুষের ভোগের পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ তার প্রচলিত রপ্তানীযোগ্য শিল্প সামগ্রীর বাজার হারাতে বসেছে। তাই পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সংগতি রাখার জন্য আমাদেরকে বিভিন্ন অপ্রচলিত পণ্য উন্নয়নের প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে। এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের বিদেশী বাজার অনুসন্ধানে তৎপর হতে হবে। উদার বাণিজ্য ও মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে দেশের বাজার বিদেশী দ্রব্যের দখলে চলে যাচ্ছে এবং দেশীয় শিল্পসমূহ তাদের বাজার হারাচ্ছে। তাই এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের মাধ্যমে দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষণ করা খুবই জরুরী। শ্রমের উৎপাদনশীলতার সাথে মজুরীর ধনাত্মক সম্পর্ক রয়েছে। তাই উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি, শিল্প খাতের গতিশীলতার কথা বলতে গেলে মজুরীর প্রশ্নকে কোনভাবেই পাশ কাটানো যায় না। শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় মজুরী কমিশন স্থাপন করা দরকার এবং এর সুপারিশ মোতাবেক শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা দরকার।

সর্বোপরি দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা শিল্পায়ন তথা বৈদেশিক বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। কিন্তু স্বাধীনতা পূর্বকাল থেকে বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব রয়েছে। এবং বর্তমানেও এ অবস্থা বজায় রয়েছে। ফলে, কোন শিল্পনীতি যথাযথভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। এ কারণে দেশের শিল্পখাতে দীর্ঘমেয়াদী স্থবিরতা বিদ্যমান। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করা সম্ভভ না হলে শিল্পায়নের পদক্ষেপসমূহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। বাংলাদেশের বৈদেশিক আয়ের অন্যতম উৎস হচ্ছে রপ্তানি খাত। এ রপ্তানী আবার শিল্প পণ্য নির্ভর। বাংলাদেশের রপ্তানি দ্রব্য বৈচিত্রহীন। গুটি কয়েক পণ্য পৃথিবীর অল্প কয়েকটি দেশে রপ্তানী হয়ে থাকে। তাই বিশ্বব্যবস্থায় পরিবর্তন কিংবা এ সকল দেশের যে কোন ধরনের অর্থনৈতিক সংকট বাংলাদেশের রপ্তানী তথা শিল্প খাতকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে থাকে। বিগত কয়েক বছরে দক্ষিণ এশিয়ায় মুদ্রা সংকট, উন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক মন্দা আমাদের রপ্তানী বাণিজ্যে ঋণাত্মক প্রভাব ফেলেছে যা নিম্নের সারণী হতে স্পষ্ট।

সারণী-৫ ঃ বাংলাদেশের শিল্প পণ্য রপ্তানী ২০০০ ও ২০০১

(মিলিয়ন ইউ এস ডলার)

আইটেম	ক্যালেন্ডার বছর ২০০০ (জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর)	ক্যালেন্ডার বছর ২০০১ (জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর)	প্রবৃদ্ধির হার
উভেন আর.এম.জি	২৫১৪৭	২৪৩৪.৩	-৩.২
নীট আর.এম.জি	১০৭২.১	১১১৩.৩	৩.৮
হিমায়িত মৎস্য	২৯৮.৫	২১২.৫	-২৮.৮
চামড়া	১৫৭.৬	১৯৭.৩	২৫.২
পাটজাত দ্রব্য	১৮৭.৫	১৬৩.২	-১৩.০
অন্যান্য	৫২৩.৪	৫৬৯.৬	৮.৮
মোট রপ্তানী	৪৭৫৩.৮	৪৬৯০.১	-১.৩

উৎস ঃ বাংলাদেশ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর ডাটাবেস থেকে সংগৃহীত।

৯.০ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতিমালা ও বাংলাদেশের শিল্পায়ন

১৯৮০ এর দশকে বিশ্বব্যাপী বাজারমুখী বাণিজ্য উদারীকরণ এর যে প্রক্রিয়া শুরু হয় তার সর্বশেষ ধাপ হচ্ছে ডব্লিউ. টি. ও বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতিমালাসমূহ। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে উন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তাদের বাজার বিস্তৃত করা এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনীতিকে চাপিয়ে রাখার কৌশল হিসেবে বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ করতে থাকে এবং বিশ্ব সম্প্রদায়কে এসকল নীতিমালা পালনে বাধ্য করতে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় বিশেষভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হবে বাংলাদেশের তৈরী পোষাক শিল্প খাত, যা এ দেশের রপ্তানী আয়ের প্রায় ৬০ শতাংশের যোগান দিয়ে থাকে। কেননা উন্নত দেশগুলো তৈরী পোষাক আমদানীর উপর থেকে কোটা তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে বাংলাদেশকে অন্যান্য দেশের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হবে; এছাড়া বাংলাদেশে এখনো তৈরী পোষাক শিল্পের পশ্চাদ সংযোগকারী শিল্প ব্যাপকভাবে স্থাপিত হয় নাই অর্থাৎ এ দেশকে এখনো তৈরী পোশাকের উপকরণ-কাপড় ও সুতা আমদানী করতে হয়। কিন্তু আমদানীকারক দেশসমূহ আমদানী বন্ধ করে দিয়ে নিজেরাই তৈরী পোষাকের বাজারে প্রবেশ করলে বাংলাদেশ ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তৈরী পোষাক শিল্পের অনুকূলে বাংলাদেশে শুধুমাত্র সস্তা নারী ও শিশু শ্রম বিদ্যমান রয়েছে। অতিসম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র "Globalization with a human face" এ শ্লোগানের আওতায় তৈরী পোষাক শিল্পে শ্রমমান কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের শর্ত আরোপ করেছে। ফলে শিল্প ইউনিটসমূহ থেকে শিশু ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক নারী শ্রমিকদের বাদ দিতে হয়েছে। আবার অন্যদিকে উন্নত দেশসমূহ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকাসমূহে শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণে ট্রেড ইউনিয়ন চালু করার জন্য চাপ দিচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের এক্ষেত্রে তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায় যে, ট্রেড ইউনিয়নসমূহ শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করে না বরং শিল্পের গতিশীলতার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তাই পরিবর্তিত এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে বিকল্প শিল্পসমূহ স্থাপনের দিকে অধিক মনোযোগী হতে হবে।

১০.০ সম্মুখে করণীয়

বাংলাদেশের শিল্পখাতের সমস্যাসমূহ রাজনীতিবিদ, নীতিনির্ধারক, গবেষক কারো অজানা নয়। এ সমস্যাসমূহ সমাধান করে শিল্পখাতে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু এ নীতিসমূহ যথাযথ প্রয়োগ করা সম্ভব হয় নাই। ফলে শিল্পখাতে এক স্থায়ী দীর্ঘমেয়াদী স্থবিরতা বিরাজ করছে। এ স্থবিরতা দূর করে শিল্পখাতে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজন শিল্পখাতের দুর্বলতাসমূহ পুনমূল্যায়ন এবং সেগুলোর সমাধানে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন। এর জন্য প্রয়োজন দৃঢ় রাজনৈতিক অংগীকারসম্পন্ন একটি গণতান্ত্রিক সরকার। যে সরকার দলীয় নীতির ঊর্ধ্বে উঠে শিল্পখাতের সমস্যাসমূহ সমাধানের লক্ষ্যে ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচি পরিচালনা করবে। বহিস্থঃ কোন চাপে নয় বরং নিজস্ব বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে সরকার সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। আবার পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থায় বাংলাদেশের শিল্পখাত যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে বা হতে পারে সেগুলো সমাধানের লক্ষ্যে দ্রুত এবং দূরদর্শী পদক্ষেপ নিতে হবে। এবং বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায়-আমাদের সামনে যে সকল সুযোগ আসে সেগুলো কাজে লাগানোর প্রতি অংগীকারাবদ্ধ হতে হবে। বাংলাদেশ এখনো সর্বোতভাবে কৃষি প্রধান দেশ, কৃষিখাত থেকে প্রাপ্ত কাঁচামালসমূহ বিদেশে রপ্তানী করে তুলনামূলকভাবে কম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। কিন্তু কৃষি ভিত্তিক শিল্প গড়ে তুলে ঐ সকল শিল্প পণ্য বিদেশে রপ্তানী করা গেলে বাংলাদেশ অনেক বেশী বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে। যা শিল্প খাতের উন্নয়নে কাজে লাগানো যেতে পারে। তাই কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য খাতে সমন্বয় সাধন জরুরী। সর্বোপরি নীতি নির্ধারকদের অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে একটি সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে শিল্প খাতের প্রতি অধিক মনোযোগ দিতে হবে। কেবল তাহলেই শিল্পখাতের বিদ্যমান স্থবিরতা দূরীভূত হয়ে গতিশীলতা সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম হবে।

তথ্য নির্দেশিকা

আনু মুহাম্মদ- ৯৫ ঃ ***বাংলাদেশের উন্নয়ন কি অসম্ভব?*** জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনা,ঢাকা।

ইরফান হবিব, ১৯৭৮ ঃ ***ঔপনিবেশিক আমলে বাংলা, কলকাতা*** ঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৭,১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০০, ২০০১, ২০০২) ***বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা,*** ঢাকা।

Bays et. al, 1998 : ***Bangladesh at 25 : An Analytical Discourse on Development;*** UPL, Dhaka.

Hossain et. al. 1996 : ***In Quest of Development : The Political Economy of South Asia,*** UPL, Dhaka

Kuddus et. Al. 1996 : ***Development Issues of Bangladesh;*** UPL, Dhaka

Salim, Ruhul Amin (1998), ***Industrial policy in Bangladesh*** : Asia-pacific Development Journal : 5(1) : 70-93,

Schumpter (1978) : ***The Economics of Development,*** Oxford University Press, Oxford, U.K.

Sobhan et. Al. 1991 : ***The Decade Of Stagnation*** : The State of Bangladesh Economy in the 1980's.

Zafarullah et. Al. 1995 : ***Policy Issues in Bangladesh;*** UPL, Dhaka.

সারণী প-১ ঃ ১৯৯২/৯৩-১৯৯৮/৯৯ সাল পর্যন্ত ১৯৮৪/৮৫ সালো স্থিরমূল্যে ম্যানুফ্যাকচারিং জিডিপি ও প্রবৃদ্ধির হার

	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/২০০০
ক্ষুদ্র ও কুটির	৬০৩৩.৪ (৭.৯)	৬৫২২.০ (৮.১)	৭০৬১.৯ (৮.৩)	৭৬০৯.১ (৭.৮)	৮১২৪.০ (৬.৮)	৮১৮৪.৯ (০.৭৫)	৮৬৫৯.৩ (৫.৮)
মাঝারি থেকে বৃহৎ	১৪১২২.০ (৮.২)	১৬৬২৯.৭ (১১.৪)	১৭৫৭৩.২ (৩.৯)	১৮২৭০.৪ (৯.৩)	১৯৬৬.৮ (৪.২)	২০৮০৩.৩ (৪.৪)	২১৭০৮.৬
মোট	২০৯৫৫.৪ (৮.১)	২৩১৫.১৭ (১০.৫)	২৪৬৩৫.১ (৬.৪)	২৫৮৭৯.৫ (৫.০)	২৮০৯০.৮ (৮.৫)	২৮৯৮৮.২ (৩.২)	৩০৩৬৭.৯ (৪.৮)

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০২।

নোট ঃ বন্ধনীর ভিতর শতকরা প্রবৃদ্ধির হার।

সারণী প-৩ ঃ শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধির হার, ১৯৭৩-১৯৯৩

	১৯৭৩	১৯৭৮	১৯৮২	১৯৭৩-৮২	১৯৮৫	১৯৯০	১৯৯১-১৯৯৩
শিল্প ইউনিটের সংখ্যা	-১৫.১৫	৬.৬৯	৬.৪৭	৪.৩৭	৫.১৯	৭.৩১	৫.৬০
স্থির সম্পদ	১৬.৯৮	১৭.৮৮	২১.৮৪	২০.৩৬	১৮.৭৮	১২.২৫	১৭.১৪
নিয়োগ	১০.৪২	৮.৯২	৩.৭২	১০.৭৬	৩.৭৫	৩.৬৪	৩.৮৫
উৎপাদন	৩২.২৫	২০.৬২	-৪৮.৭	২৩.৫২	২.১৪	৮.০৪	১০.৪৬
মুল্য সংযোজন	২৩.৪১	২৪.৭৪	-৯.১৩	৮.৮৭	-৪.৬৭	৬.৪৫	৩.৬৪

উৎস ঃ Asia-pacific Development Journal :Vol.5, No.1, June 1998 পৃষ্ঠা-৭৭।

সারণী প-২ ঃ ১৯৯২/৯৩-১৯৯৮/৯৯ সাল পর্যন্ত ১৯৮৪/৮৫ সালো স্থিরমূল্যে ম্যানুফ্যাকচারিং জিডিপি ও প্রবৃদ্ধির হার

	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	১৯৯৮/৯৯	১৯৯৯/২০০০
মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সুচক	১৫৩.৮৯	১৬৩.৩৩	১৭৩.৫০	১৭৯.৩০	১৯৫.৯৪	২০৪.১৫	২১৩.০২

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০২।

সারণী প-৪ ঃ প্রধান শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন

পণ্যদ্রব্য	একক	১০০১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮
পাটজাত দ্রব্যাদি	০০০ মেঃ টন	৪১৬.০	৪৪৬.০	৪২১.০	৪২৫.০	৪০৫.০	৪০৫.০	৪০৮.০
চা পাতা	মিলিয়ন কেজি	৬০.৫	৬০.৬	৫৭.৩	৪৯.১	৪৯.৯০	৫০.১৬	৫৩.০৫
কলের তৈরী কাপড়	মিলিয়ন মিটার	৫৮.৯	৪৫.১	৩১.৬	১৭.০	১০.২৮	১০.৯০	১০.৪২
কাগজ	০০০ মেঃ টন	৮৮.৪	৮৯.৭	৯০.৯	৮২.৮	৮২.৩৬	৬৭.৫২	৪৫.৯১
পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি	০০০ মেঃ টন	১০১৭.৩	১৩২০.৭	১১৯.৪৭	১৩৭.৩	১১৬০.০	১৩০৯.৮৫	১৪২৬.৪৪
বাবার	০০০ মেঃ টন	১৭৩৫.৬	২০৫০.৬	২৩৬৬.১	২১৪৪.৯	২২৪৮.০	১৭৭২.৬৬	২০৩০.৬৭
সিমেন্ট	০০০ মেঃ টন	২৭২.৫	২০৭.৫	৩২৩.৭	৩১৬.৪	৪২৫.৭	৬১০.৫	৫৯১.১২
চিনি	০০০ মেঃ টন	১৯৫.৪	১৮৭.৫	২২১.৪	২৭০.১	১৮৪.০	১৩৫.৩২	১৬৬.৪৪
প্রস্তুতকৃত পোষাক	মিলিয়ন ডজন	৩১.০	৩৬.০	৩৪.৩	৪৭.২	৪৮.৮২	৫৩.৪৫	৬৫.৫৯
	মিরিয়ন টাকা	৪১৩১৪	৪৮১৯.৩	৫১৪৭.২	৬৭৮৩২	৭৯৭০৬	৯৪৬৫৭	১২৩৭৫২
এস. এস. রড	০০০ মেঃ টন	৪৪.৭	৫০.৭	৯০.২	১৪৯.০	১৪০.৮৭	১৫১.৫৩	১৬১.১৪
	০০০ মেঃ টন	৪৬.০	৪৯.০	৫১.০	৪৭.০	৫১.০	৫৪.০৬	৫৮.৬১
পানীয়	মিলিয়ন ডড়ন বোতল	৮.০	১০.০	১১.০	১২.০	১০.০	৯.৪৯	১০.৯৯
সাবান ও ডিটারজেন্ট	০০০ মেঃ টন	৩২.০	৩৪.০	৩৭.০	৪৬.৫	৪৯.০	৫১.০৫	৪৭.৮৪
চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যাদি	মিলিয়ন বর্গ মিটার	১১.০	১২.৯	১৪.৬	১৫.০	১৫.৯০	১১.৯৫	১২.১২

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ১৯৯৯।

নোট ঃ বিটিএমসি ও বিটিএমএ-এর অধীনস্ত বৃহৎ আকারের মিলের উৎপাদিত সুতা ও কাপড়।

সারণী প-৫ ঃ বাংলাদেশের পোষাক শিল্পের বিকাশ

বছর	পোষাক শিল্পের বৃদ্ধি (সংখ্যা)	প্রবৃদ্ধির হার (%)
১৯৮৪	২১০	-
১৯৮৫	২৫৯	২৩.৩৩
১৯৮৬	৪০০	৫৪.৪৪
১৯৮৭	৭৫৩	৮৮.২৫
১৯৮৮	৭৫৪	০.১৩
১৯৮৯	৭৫৬	০.২৬
১৯৯০	৭৫৬	০.০০
১৯৯১	৮০২	৬.০৮
১৯৯২	১৩০০	৬২.০৯
১৯৯৩	১৬০০	২৩.০৮
১৯৯৪	১৮৫০	১৫.৬৩
১৯৯৫-৯৭	১৭৯২	(৩.১৪)
১৯৯৭-৯৯	১৫৬০	১২.৯৫

উৎস ঃ সাপ্তাহিক বিচিত্রা ১৮ই মার্চ, ১৯৯৪ এবং লেখকের হিসাবকৃত, পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

নোট ঃ বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যা ঋণাত্মক নির্দেশক।

সারণী প-৬ ঃ মোট রপ্তানী আয়ে পোশাক শিল্পের অবদান

সাল	মোট রপ্তানী আয় (কোটি টাকায়)	তৈরী পোষাকের রপ্তানী আয় (কোটি টাকায়)	মোট রপ্তানী আয়ে তৈরী পোষাকের অংশ (%)
১৯৮৮-৮৯	৪১৬.১	১৩৭৮.০	৩৩.৫
১৯৮৯-৯০	৪৮৯২.৯	১৯৪৯.২	৩৯.৮
১৯৯০-৯১	৫৯৫৫.৯	২৮১২.২	৪৭.২
১৯৯১-৯২	৭২৬২.৭	৩৯৬৭.১	৫৪.৬
১৯৯২-৯৩	৮৩৬৯.৫	২৮০২.৩	৫৭.৪
১৯৯৩-৯৪	৯৩৮৭.৭	৫৬৪৬.০	৬০.১
১৯৯৪-৯৫	১২৩০৮.০	৭৪৩৭.৮	৬০.৮
১৯৯৫-৯৬	১২৭২.১	৮১৮৪.২	৬৪.৩
১৯৯৬-৯৭	১৪৯৮.২	৯৮৯২.৫	৬৬.০
১৯৯৭-৯৮	১৭৯৪২.৫	১২৬১৭.৩	৭০.৩
১৯৯৮-৯৯	১৭৯৪০.৩	১২৯৭৬.১	৭২.৩

উৎস ঃ বার্ষিক রপ্তানী আয় (১৯৯০-৯১ হতে ১৯৯৮-৯৯) পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী প-৭ ঃ ১৯৯১/৯২ ডিসেম্বর হতে ২০০০ সাল পর্যন্ত বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধনকৃত বিনিয়োগের পরিমাণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বছর	দেশী	বিদেশী	মোট
১৯৯১-৯২	৯১	২৫	১১৬
১৯৯২-৯৩	৯০	৫৩	১৪৩
১৯৯৩-৯৪	৪৫৭	৮০৪	১২৬১
১৯৯৪-৯৫	৮৪৬	৭৩০	১৫৭৬
১৯৯৫-৯৬	১১৭১	১৫১৬	২৬৮৭
১৯৯৬-৯৭	১১০৮	১০৫৪	২১৬২
১৯৯৭-৯৮	১০৪৩	৩১৫৬	৪১৯৯
১৯৯৮-৯৯	১১৮৩	১৯২৬	৩১০৯
১৯৯৯-০০	৩৮১	২১১.৯	২৫০০
মোট	৬,৩৭০	১১,৩৮৩	১৭,৬৭৩

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, বিভিন্ন সংখ্যা।

সারণী প-৮ ঃ বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধনকৃত শিল্পখাতে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ

শিল্পখাত	৯৩/৯৪	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬	৯৬/৯৭	৯৭/৯৮
কৃষিভিত্তিক শিল্পসমূহ	১৬.৭	৪১.০	৪.০	১৫.৯০	৭.৯৫
খাদ্য ও খাদ্য সম্পর্কিত	৩.৪	১৩.৪	৪০.০	৪৮.৮৯	৩৪৬.৪৭
বস্ত্র শিল্প	৩৬০.৩	১৬৯.০	৭৯.০	১০৬.৯১	৯২.৭৬
মুদ্রণ ও প্রকাশনা	১.১	৫.৩	২৬.০	৯.০	-
চামড়াজাত দ্রব্য ও রাবার	৪.৯	২২.৫	১৬.০	৪.০৫	২১.০৯
রসায়ন শিল্প	৩৭২.০	১২৬.৫	৫৭২.০	১১.৬৪	৫৩.৮৫
গ্লাস, সিরামিক ও ও অন্যান্য অধাতব	১২০.১	৪৭.০	১১৫.১৯	-	৯৯.৩৯
প্রকৌশল শিল্প	২৪.১	১৭৮.০	১০১.০	২১.৩১	১০.৬২
সেবামুলক শিল্প	৯.১	৪৯.৫	১৪০.০	৫৯৬.৫৯	২২৩৭.১
বিবিধ	৪.৬	৪.১	৪৯১.০	২২.০৬	২৪৪.৬২
	৮৫০.২০	৬.৭৭৪০	১৫৫৪.১০	১০৫৩.৫০	৩১৫৬.২০

উৎস ঃ বিনিয়োগ বোর্ড রিপোর্ট ১৯৯৯।

সারণী প-৯ ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসমুহের নীট মুনাফা/লোকসানের বিবরণ

কর্পোরেশনের নাম	১৯৯২/৯৩ (প্রকৃত)	১৯৯৩/৯৪ (প্রকৃত)	১৯৯৪/৯৫ (প্রকৃত)	১৯৯৫/৯৬ (প্রকৃত)	১৯৯৬/৯৭ (প্রকৃত)	১৯৯৭/৯৮ (প্রকৃত)	১৯৯৮/৯৯ (সাময়িক)	১৯৯৯/২০০০ (সাময়িক)
বি টি এম সি	(১৪৪.৬৫)	(১৫৩.৮৭)	(১১৭.০৪)	(৩৪.৪০)	(১৬৩.২৬)	(৯২.৭০)	(৮০.৩০)	(৫৩.০০)
বি এস ই সি	(১২৯.২০)	(১১০.২২)	(৬৮.৩৬)	(৬৪.৫০)	(১০৩.২৮)	(১১২.৪০)	(৫.১০)	(০.২০)
বি এস এফ আই সি	(৮৬.১৬)	(১৯.৬০)	২.৫৩	(৩৭.৮০)	(৬৫.২৯)	(৩৯.২০)	(৬০.০০)	(৪৮.৬০)
বি সি আই সি	২০.৫৮	২৫.৪৯	(৭৫.৪৭)	(১২১.৪০)	(২৩৭.১২)	(৬৮.৯০)	(১৪২.৪০)	(২১২.৮০)
বি এফ আই ডি সি	(১৩.২৩)	(৫.০৯)	১.১৬	৩.০০	১.৭১	(৭.০০)	(৬.৩০)	৮.০০
বি জে এম সি	(৫২৩.৩৫)	(৬০.০৫)	(৩১.৪৩)	(৯৬.২০)	(২৫১.৭১)	(২৭৫.৯০)	(২৯৫.১০)	(২৬৪.৫০)
মোট	(৮৭৬.০১)	(৩২৭.৩৪)	(২.৮৮.৬১)	(৪৫৭.৩০)	(৮১৯.৭৫)	(৫৯৬.১০)	(৫৮৯.১০)	৫৭১.১০)

উৎস ঃ মনিটারিং সেল, অর্থ বিভাগ, (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০০)

নোট ঃ বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যা লোকসান নির্দেশক।

সারণী প-১০ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসমুহের খেলাপী ও মোট ঋণের পরিমাণ (ক্রমপুঞ্জিত)

(কোটি টাকা)

কর্পোরেশনের নাম	মোট ঋণ	খেলাপী ঋণ
বি টি এম সি	৬৮৩.৯৭	৬৩৫.৭৮
বি এস ই সি	৯৬৫.০৭	৮৩৭.০২
বি এস এফ আই সি	২৪৩.০১	৪৬.৩০
বি সি আই সি	২২৮.৭৬	৩৯.৭৩
বি এফ আই ডি সি	২.৬৬	০.৬১
বি জে এম সি	১৬৭৩.৪৭	২৩৭.২০
মোট	৩৭৯৬.৯৪	১৭৯৬.৬৪

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০০।

সারণী প-১১ ঃ মোট আমদানীতে বিভিন্ন দ্রব্যের শতকরা অংশ

সময়কাল	ভোগ্যদ্রব্য ও ভোগ্যদ্রব্য প্রস্তুতের উপকরণ	পুঁজিদ্রব্য ও পুঁজিদ্রব্য উৎপাদনের উপকরণ
১৯৭৪-৮০	৬৬.৮	৩৩.২
১৯৮১-৮৫	৬২.২	৩৭.৮
১৯৮৬-৯০	৬৮.৫	৩১.৫
১৯৯১-৯৫	৬৬.৩	৩৩.৭
১৯৯৫-০০	৬৩.৫	৩৬.৬

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ (বিভিন্ন সংখ্যা)